রিসাইটাল স্ফেরিকাল রবিবার

একটি ভিন্নধর্মী শিল্পে পত্রিকা

ই-পত্রিকা	সংখ্যা -২	recitalspherical.org	২১.১১.২০২১	____ /-

বিশ্ব দূরদর্শন দিবস

২১ শে নভেম্বর ১৯৯৬

রোহিত মজুমদার :

১৯৯৬ সালে ইউনাইটেড নেশন সাধারণ পরিষদ ২১ শে নভেম্বর দিনটিকে বিশ্ব টেলিভিশন দিবস (World television day) ঘোষনা করে। জাতিসংঘ দূরদর্শন কে শিল্প বিনোদনের দূত হওয়ার পাশাপাশি মানুষের দৈনিক জীবনে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তাকারী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। দূরদর্শন যে কেবল বিনোদন প্রেরণের মাধ্যেমে মানুষের মনোরঞ্জন করে তাই নয়, বরং দূরদর্শন হলো যোগাযোগ এবং বিশ্বায়নের প্রতীক, যা আমাদের প্রতিনিয়ত পৃথিবী জুড়ে ঘটতে থাকা সকল বিষয়ের প্রতি অবগত করে তোলে।

মানুষের সিদ্ধান্ত ও মতামত কে শিক্ষিত করে তোলে অতি অমূল্য তথ্য প্রদানের মাধ্যমে। আমাদের রোজকার জীবনকে নানা ভাবে প্রবাভিত করে তোলার পিছনেও দূরদর্শনের ভূমিকা অসীম।১৯২৭ সালে ২১ বছর বয়সী এক তরুণ, নাম : ' ফিলো টেলর ফার্নসওয়ার্থ,' বিশ্বের প্রথম বৈদ্যুতিক টিভির আবিষ্কার করেন। যদিও তার জীবনের শুরুর প্রায় ১৪ বছরের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত তিনি বিদ্যুৎবিহীন বাড়িতেই বসবাস করেছেন।

উচ্চবিদ্যালয়ে থাকাকালীন টেলরের মাথায় এক অসাধারণ চিন্তার আনাগোনা শুরু হয়েছিল। তিনি ভাবতে শুরু করেছিলেন কিভাবে এমন এক যন্ত্র তৈরি করা যায় চলমান ছবিকে তুলে ধরা যায়। তারপরই ১৯২৭ সালে পৃথিবীর সামনে হাজির করেন প্রথম বিদ্যুৎচালিত টিভি। যদিও সমসাময়িক এক টেলিভিশগুলো ছিল বে-রঙিন, এক কথায় সাদা কালো। তার পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৯২৮ সালে 'জন লগি বেয়ার্ড' বিশ্বের প্রথম রঙিন টেলিভিশনটি আবিষ্কার করে ছিলেন।আজকের দিনে দূরদর্শন হলো এমন এক বিশিষ্ট গণমাধ্যম যা বিনোদন, শিক্ষা, সংবাদ, রাজনীতি, গসিপ প্রায় সব কিছুই মানুষের সামনে এনে দেয় নিমেশের মধ্যে।

দুরত্ব আজ আর বাধা হয়ে দাড়ায় না আমাদের সামনে। বর্তমানে মহামারী সময় কালে দূরদর্শনের দর্শকসংখ্যা একলাফে বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে টেলিভিশন আজকের দিনে শিক্ষা ও বিনোদনের এক সুস্থ উৎস। এটি যথাযত তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সমাজের সুস্থতা, সুরক্ষা বজায় রাখতে এক গুরুতর ভূমিকা পালন করে এসেছে যুগ যুগ ধরে যার ব্যতিক্রম আজও ঘটেনি।

সারাবিশ্ব জুড়ে এই টেলিভিশন দিবসের দিনটিকে নানান ভাবে পালন করা হয়ে থেকে। কোথাও যেমন সাংবাদিক, লেখক, বিভিন্ন খবরের কাগজ বা আরো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব রা নিজেদের লেখা, ছবি, গান বা অন্যান্য শিল্প প্রদর্শনের মধ্যে দিয়ে সমাজে দূরদর্শনের ভূমিকা বা প্রয়োজনীয়তা কে তুলে ধরার চেষ্টা করেন, বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এই ধরনের বিষয় গুলি প্রচারের ক্ষেত্রে।

তাছাড়া স্কুল কলেজ গুলিতে মিডিয়া ও যোগাযোগ মাধ্যমের সমস্যা ও তার সমাধান গুলি কে নিয়ে আলোচনা করা, বা এই সকল বিষয় গুলি সম্পর্কে মানুষকে অবগত করে তোলার জন্য বিশিষ্ট অতিথিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়ে থাকে।টেলিভিশন কিভাবে সমাজের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও সাধারণের বোঝাপড়া কে উন্নত করে তোলে তা কিন্তু আমাদের সকলেরই জানা। গণতন্ত্র, শান্তি ও বিশ্ব স্থিতিশীলতার জন্যে দূরদর্শনের ভূমিকা যে কতখানি সাধারণত তা তুলে ধরবার জন্যই আজকের এই দিনটিতে সারাবিশ্বে বিভিন্ন সম্মেলন সভা ও বক্তব্য সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিজ্ঞাপন

গ্রামোফোনের আবিষ্কার

গ্রামোফোন

রাখী সাঁফুই । ২১.১১.২০২১

আধুনিক সমাজে সিডি, ক্যাসেট, ইউটিউব, ফোন মিউজিক ইত্যাদির জন্য প্রায় হারিয়ে গেছে গ্রামফোন। ইতিহাসের পাতায় এক উল্লেখযোগ্য স্থানে রয়েছে এই গ্রামফোন।

গ্রামোফোন কী?

যন্ত্রের দ্বারা ধারণকৃত শব্দকে বাজানোর জন্য ব্যবহৃত এক প্রকার যন্ত্র। গ্রামফোন নিজস্ব যন্ত্রের সাহায্যে ঘুরানো হয় এবং এর উপরে শব্দরেখার উপর সূঁচালো একটি শলাকার অগ্রভাগ ছুঁয়ে যাওয়ার সময়, শব্দরেখার কম্পাঙ্ককে শনাক্ত করে, শব্দ উৎপন্ন হয়।

গ্রামোফোনের ইতিহাস

যন্ত্রের দ্বারা ধারণকৃত শব্দকে বাজানোর জন্য ব্যবহৃত এক প্রকার যন্ত্র। গ্রামফোন নিজস্ব যন্ত্রের সাহায্যে ঘুরানো হয় এবং এর উপরে শব্দরেখার উপর সূঁচালো একটি শলাকার অগ্রভাগ ছুঁয়ে যাওয়ার সময়, শব্দরেখার কম্পাঙ্ককে শনাক্ত করে, শব্দ উৎপন্ন হয়। গ্রামোফোনের আবিষ্কারক টমাস এডিসন । তিনি এমন একটি ব্যক্তি যিনি শব্দ সংরক্ষণের জনক হিসেবে পরিচিত হন। তিনি সর্বপ্রথম তাঁর প্রিয় কবিতা "মেরি হ্যাড এ লিটল ল্যাম্প"এ ফুটিয়ে তোলেন এই যন্ত্রে ও তার নাম দেন, ফনোগ্রাফ।

তবে পরবর্তীকালে জার্মান বিজ্ঞানী বির্ণিলার টিনফয়েল এই নাম কে পরিবর্তন করে নাম দেয় গ্রামোফোন। সর্বপ্রথম গ্রামোফোন কোম্পানি গড়ে ওঠে জার্মানিতে তখন সাল ১৮৯৮। তবে এই ফনোগ্রাফ থেকে গ্রামোফোন হয়ে ওঠার পুরো পদ্ধতিতে ব্রিটিশ সংস্করণের ছাপ রয়েছে। এই মাধ্যম পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে প্রচুর গ্রামোফোন কোম্পানি প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

গ্রামোফোনের বিস্তার লাভ

ব্রিটিশ প্রভাব থাকলেও গ্রামোফোনের বিস্তার বাংলাতেও কম ছড়ায়নি। বাংলার গ্রামোফোন কোম্পানি প্রথম রেকর্ডিং ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন"করান এফ. ডব্লিউ গেইসবার্গ । ১৯০০-১৯০৭ সালের মধ্যে তিনি ভারতসহ অন্যান্য স্থানে ঘুরে বেড়ান এবং গ্রামোফোনের প্রচার করতে থাকেন। এলাকাবাসীদের সাথে নিজের কথোপকথনের মাধ্যমে তিনি এর প্রচার করেছিলেন।

প্রথম দিকে তেমন সাড়া না মিললেও পরে ১৯০২ সালে প্রথম ভারতীয় শিল্পীর রেকর্ড তৈরি করেন, কলকাতাবাসী গওহরজান। ৭ ও১০ ইঞ্চির ব্যাসে একটি রেকর্ড করেন , যার ফলে তিনি রাতারাতি খুব বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন। বিশ শতকের কিছু বিখ্যাত গ্রামোফোন কোম্পানী ছিল, মাস্টার ভয়েজ যা একটি ব্রিটিশ কোম্পানি, পঠে ফ্রেন্স কোম্পানি এবং আমেরিকান কোম্পানি কলাম্বিয়া।

বাংলায় গ্রামোফোনের প্রভাব

প্রথম থেকেই গ্রামোফোন এর আবিষ্কর্তা এই নিয়ে বেশ বিতর্ক লেগে থাকে বৈজ্ঞানিক মহলে। গেইসবার্গ প্রথম একজন ভারতীয় রেকর্ড শিল্পী হিসেবে আখ্যা পান। অন্যদিকে গ্রামোফোন রেকর্ড তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রথম ভারতীয় উদ্যোক্তা হেমেন্দ্র মোহন বসু । তিনি একটি রেকর্ডিং সংস্থা গঠন করেন এবং পরে পঠে কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তারপর তিনি হিজ মাস্টার্স ভয়েজ থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী গ্রহণ করে স্থানীয় এলাকাবাসীর কণ্ঠস্বর রেকর্ড করতে থাকেন। তারপর তিনি লক্ষ্য করতে থাকেন ফনোগ্রাফ বা গ্রামোফোন ব্যবস্থার প্রচার ক্রমশ বৃদ্ধি করতে। তাই তিনি কলকাতায় নিজস্ব রেকর্ডিং সংস্থা স্থাপন করে নেন। এই রেকর্ডিং সংস্থায় বাংলা থেকে শুরু করে হিন্দি, উর্দু ভিন্ন ভিন্ন সঙ্গীত শিল্পীদের নিয়ে অনুষ্ঠান ধারণ করতে শুরু করেন তিনি।পরবর্তীকালে এর বিস্তার দেখে লন্ডনের নিকল ফেরেস লি. একটি কোম্পানির খোলেন যার নাম-ইন্ডিয়ান রেকর্ড মেনুফেকচারিং কোম্পানি । যেটিও রাতারাতি বেশ খ্যাতি লাভ করেছিল। বিশ দশকের দিকে গ্রামোফোন বাঙালি পরিবারের একটি মর্যাদাপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়। গত শতকের ষাটের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত দেশের অনেক বনেদি পরিবারের গ্রামোফোনের ব্যবহার চলত।

ভারতে গ্রামোফোনের আগমন নিয়ে বিতর্ক লেগেই থাকে

আন্দামান ও ভারত মহাসাগর কে অতিক্রম করে এই মহাদেশে প্রথম কলের গানের প্রচার হওয়ার মুম্বাই ও কলকাতায়। তবে সূত্র মতে জানা যায়, ১৮৯৫ সালে সর্বপ্রথম স্বামী বিবেকানন্দ উপহার হিসেবে গ্রামোফোন পান তাঁর বন্ধুর কাছ থেকে।
বাংলা কলকাতার বেলিয়াঘাটাতে প্রথম এশিয়ান রেকর্ড কারখানা স্থাপন হয় সাল তখন ১৯০৮,১৯ জুন। গানের শিল্পীদের জন্য রেকর্ড এর ব্যবস্থা করা হয় সেখানে। রবীন্দ্র সংগীত থেকে শুরু করে নজরুল গীত, বাংলা লোকগীত, নাটক ইত্যাদি সকল প্রকার বিনোদনের জিনিস রেকর্ড করা হতো। এমনকি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ নিজের কণ্ঠে গান রেকর্ড করা হয়।

গ্রামোফোনের ব্যবহার বিলুপ্তির কারণ

আধুনিক সমাজের মাপকাঠি একটু অন্যরকম। তাই ইতিহাসের পাতায় গ্রামোফোনের পরিবর্তে এসে যায় ভিন্নকৌশল প্রযুক্তি। আর যার ফলস্বরূপ গ্রামোফোন একটি ঐতিহাসিক যন্ত্র ছাড়া বর্তমানে আর কিছুই না। তবে গ্রামোফোনের ব্যবহারকে নতুন রূপ দেওয়ার জন্য সঙ্গীত জগতে প্রায় চেষ্টা করছে। পুরানো বাদ্যযন্ত্র ঐতিহাসিক চর্চা বাড়ায় গ্রামোফোনের ব্যবহার আবারও শুরু হচ্ছে। ইতিহাসে গ্রামোফোনের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না।

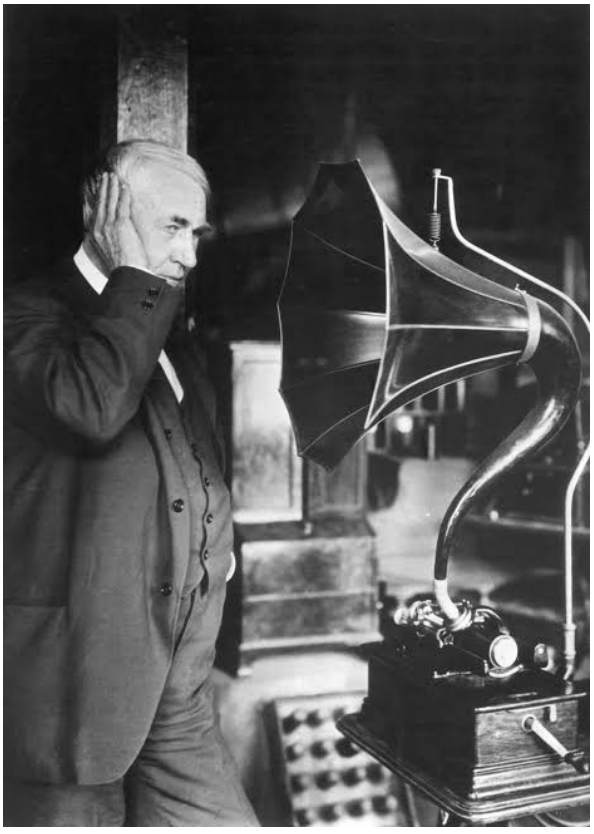

সমাজ পরিচালনার নতুন পন্থা পরাবাস্তববাদ! রেনে মাগ্যৃ কি এই দিগন্তের পথ প্রদর্শক? না কেবলই একজন শিল্পী?

রোহিত মজুমদার

ছবির মাধ্যম কথা বলা বা মনের চিন্তা ধারা কে তুলে দর্শকদের সামনে তুলে ধরবার যে অতিপুরাতন প্রচেষ্টা বিগত কয়েক দশক ধরে চলে আসছে তা আমাদের সকলেরই জানা। কিন্তু যখন ছবির মনে সাধারণের মস্তিকে প্রবেশ করার উর্ধ্বে চলে যায়, ছবির অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ উদ্ধার যখন যুগের উদ্ধারের নাগালের বাইরে তখন বলতেই হয় বিশ দশকের অন্যতম সেরা বেলজিয়ান চিত্রশিল্পী ' রেনে মাগৃতের ' কথা। যিনি ছিলেন একজন পরাবাস্তববাদী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত শিল্পী, যার জীবনের প্রায় সব প্রতিকৃতি গুলিতেই বাস্তবের চাইতে আলাদা বা উদ্ভট অবচেতন মনের ভাবনা দৃশ্যমান। এই বেলজিয়ান শিল্পী রেনে মাগৃত কে নিয়ে দুই পক্ষের তরজা আজও তুঙ্গে থাকে। কেউ কেউ দাবি করেন রেনে ছিলেন দার্শনিক। যিনি সমাজ ও রাষ্ট্রকে পরিচালনা করার এক নতুন পথের সন্ধান দিতে চেয়েছিলেন নিজের শিল্পের মাধ্যমে। কারো বা ভাষায় আবার রেনে কেবলই একজন প্রতিভাবান চিত্রশিল্পী।

সারিয়ালিস্ট (surrealist) বা পরাবাস্তববাদ বিকশিত হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে দাদাবাদী কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করে। এই চিন্তা ধারা গড়ে ওঠার পিছনে বিশেষ রসদ জুগিয়েছিল ছিল অস্ট্রিয়ান স্নায়ুবিশারদ ' সিগমুন্ড ফ্রেড ' এর অবচেতন মন তত্ত্ব। এ-আন্দোলনের সূচনা ফ্রান্সের হয় প্যারিস থেকে, ১৯২০ সালের দিকে। তখন থেকেই এটি ধারাবাহিকভাবে ঢুকে পড়তে শুরু করেছিল বিভিন্ন দেশে।শুধু তাই নয় ভাষা,চিত্র, সঙ্গীত, রাজনৈতিক চিন্তা (রাষ্ট্রচিন্তা) ও চর্চা, দর্শন এবং সামাজিক তত্ত্বেও (সমাজতত্ত্ব) স্থান পায় এই পরাবাস্তববাদ। এই মতবাদের মূলকথা অবচেতনমনের ক্রিয়াকলাপকে উদ্ভট ও আশ্চর্যকর সব রূপকল্প দ্বারা প্রকাশ করা।

এই ঐতিহাসিক আন্দোলনের মূল উদ্যোগ তুলেছিলেন ফরাসি পুরুষ কবি-সমালোচক ' আন্দ্রে ব্রেটন।' যার মূল লক্ষ্যই ছিল প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধকে নস্যাৎ করে মানুষকে একটি নান্দনিক দৃষ্টির অধিকারী করে তোলা যার মাধ্যমে মানুষ সমাজ প্রচলনের ভন্ডামি, নোংরা রাজনীতির।

বেড়াজাল ভেদ করে মানুষ পৌঁছাতে পারবে বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্যে; সেখানে পরাবাস্তববাদ আরো একধাপ এগিয়ে বলল, 'প্রকৃত সত্য কেবলমাত্র অবচেতনেই বিরাজ করে।' কেননা স্বজ্ঞানে মানুষ কেবল বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে থাকে। যাতে করে অবচেতন মনের আসল সিদ্ধান্ত টা চাপা রয়ে যায়। পরাবাস্তববাদী শিল্পীর লক্ষ্য হল তার শিল্প কৌশলের মাধ্যমে মনের সেই সত্যকে গভীর থেকে তুলে আনা।

উদাহরণ স্বরূপ যেমন বেশ কিছু ছবি আজও বর্তমান সেগুলি হলো.....

দিগন্তের রহস্য (The mysteries of horizon) ১৯২৮

এই চিত্রটি আপাতদৃষ্টিতে বোলার হ্যাটে তিনজন অভিন্ন পুরুষকে চিত্রিত করেছে। তারা গোধূলিতে একটি বহিরঙ্গন পরিবেশে আছে এবং একেকটি এক এক দিকে ঘুরে গেছে। প্রতিটি চিত্রের উপরে আকাশে একটি পৃথক অর্ধচন্দ্র। ছবিটির মূল লক্ষ্য চিকনবোলার হ্যাট পরা পুরুষদের তাদের অনির্ধারিত বা অভিন্ন ব্যক্তিত্ব হিসাবে উপস্থাপন করা হয়।

পরাবাস্তববাদের চিত্রগুলি বিস্ময়কর উপাদান দ্বারা সংগঠিত ছিল। কেউ কেউ এই সকল চিত্র গুলিকে একটি দার্শনিক আন্দোলনের অভিব্যক্তি হিসেবে দেখেছেন যার মূল উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবের মাধ্যমে পরিবর্তন আনা।

ছবির বিশ্বাসঘাতকতা (The Treachery of Images) ১৯২৯

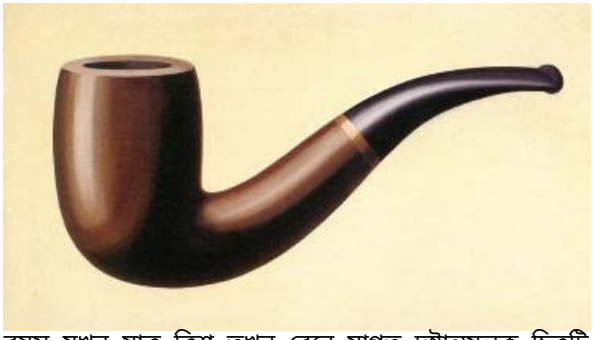

বয়স যখন মাত্র ত্রিশ তখন রেনে মাগৃত্ দৃষ্টান্তমূলক চিত্রটি বানিয়ে অবাক করেছিলেন গোটা বিশ্বকে। যার অন্তর্নিহিত মনে খুঁজে বেড় করতে মস্তিকের ঘাম ছুটিয়েছেন বহুজন। ছবিটির মাধ্যমে তিনি বলেছেন চিত্র তে অঙ্কিত বস্তুটি একটি পাইপ নয়! বরং চিত্রটিই একটি পাইপের।

মানুষের পুত্র (The Son of Man) ১৯৪৬

এই ছবিটি মাগৃত্ একটি নিজস্ব প্রতিকৃতি হিসেবে এঁকেছেন। পেইন্টিংটিতে একটি ওভারকোট এবং একটি বোলার টুপি পরা একজন ব্যক্তি একটি ছোট দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, যার ওপারে কিছুটা দুরে সমুদ্র এবং মেঘলা আকাশ। লোকটির মুখ একটি ঘোরাফেরা করা সবুজ আপেল দ্বারা মূলত অস্পষ্ট। তবে আপেলের কিনারায় উঁকি মারতে দেখা যায় লোকটির চোখ। আরেকটি সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য হল যে লোকটির বাম হাত কনুইতে পিছনের দিকে বাঁকানো দেখায়।

আলোর সাম্রাজ্য (Empire of light) ১৯৫৩

১৯৫৩-১৯৫৪ এর মধ্যবর্তী সময়কালে শিল্পী রেনে মাগৃত্ এই 'এম্পায়ার অফ লাইটস ' ছবিটি এঁকেছিলেন। এই ছবিটি তার শিল্পী জীবনে একমাত্র সময় যখন তিনি ছবির প্রকাশ্যে নিজের শিরোনাম ব্যবহার করেননি। কৌতূহলী তৈলচিত্রে একটি সুন্দর ঘর দেখানো হয়েছে যা এর অভ্যন্তরীণ আলোয় আলোকিত এবং রাতের অন্ধকারে ঘেরা। বিশেষ করে পরাবাস্তব হল যে বাড়ির উপরে আকাশ এবং বৃক্ষরেখাটি একটি দিনের আকাশ উজ্জ্বল এবং মোটা সাদা মেঘে পূর্ণ। এটি একটি নির্মল, রহস্যময় দৃশ্য।

শূণ্য স্বাক্ষর (The blank signature) ১৯৬৫

পরাবাস্তবদের আজীবন লক্ষ্যই ছিল সাধারণের উপলব্ধির জন্য বাস্তববাদী মানে সম্পন্ন চিত্রকে তুলে ধরা। মনবিশ্লেষকের অবচেতন মনের শৃঙ্খলার প্রভাবকে চিত্ররূপ দিয়ে তা সাধারণের কাছে বিশেষ বার্তা পৌঁছে দেয়ার কর্ম টি এই ছবিটি যথাযত ভাবে পালন করেছে যা সাধারণের ভাবনার সীমা কে অতিক্রম করেছে নিঃসন্দেহে বলা যায়।রেনে মাগৃতের শিল্পী জীবনের নিদর্শন গুলির থেকে বেশ কিছু জিনিস যেমন স্পষ্ট হয়! মানুষ যে কোনো বিষয়ের সাথেই অত্যন্ত সৃজনশীলতা অর্জন করতে পারে। খুবই সাধারণ বস্তু নিয়ে কাজ করা এবং তার থেকে গভীর ভাবনার বিবৃতি দেওয়ার মতো কাজ করায় এনার থেকে বেশি দক্ষ হয়তো আর কেউ নন। একটি নির্দিষ্ট সময়ে মানুষ কতটা গুরুতর আবার সেই সময়ে কতটা রসদপূর্ণ হতে পারে তা খুবই নিদারুণ ভাবে তুলে ধরেছেন মাগৃত তার ছবি গুলির মাধ্যমে।সবমিলিয়ে তার শিল্পী জীবন যে মানব সমাজে আজও প্রভাব বিস্তার করে চলেছে তা নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যায়।

সুরকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিখ্যাত সংগীত শিল্পী মান্না দের এক সুরেলা সন্ধ্যা

প্রিয়াঙ্কা দত্ত। ২১.১১.২০২১

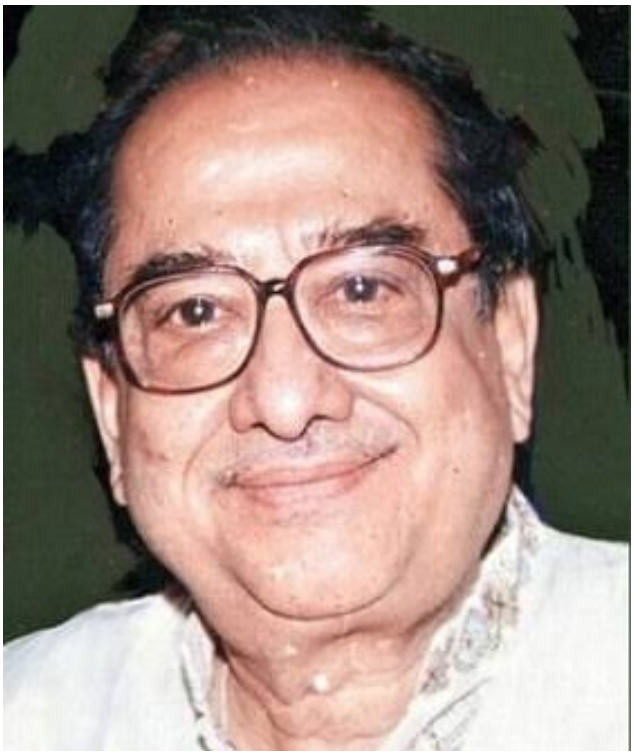

সুরকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিখ্যাত সংগীত শিল্পী মান্না দের এক সুরেলা যাত্রা আয়োজিত হয়েছিল। এক সুন্দর সুরেলা সন্ধ্যা যেটা আজও দর্শকদের কাছে বর্তমান। তারই কিছু অংশ।

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়: কলকাতার ছেলে হয়ে প্রথম প্লেব্যাক বোম্বেতে কেন? কলকাতা কী আপনাকে স্বীকৃতি দেয়নি?

মান্না দে: জওয়ানিতে অনেক কিছু স্বপ্ন দেখে, আমিও দেখতাম। আর সেই কারণেই আমার বোম্বে যাওয়া। প্রথমে কাকার (স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র দে) অ্যাসিসটেন্স হয়ে কাজ করা। অনেক ভাষা শেখা এবং ভালো ওস্তাদের সঙ্গে কাজ করব।

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়: আপনি কি ভেবেছিলেন একটি সর্বভারতীয় পরিবেশ পাবেন?

মান্না দে: আমি বিশ্বাস করতাম যে গান করলে সর্বভারতীয় পরিবেশ দরকার। আমার প্রথম কাজ ‘রাম রাজ্য’ ছবিতে, তারপর আরও অনেক ছবিতে কাজ করলেও বাংলা কিছুতে ডাকছে না। বাঙ্গালী তো মনে লাগতই। স্টাগেল এখনও করছি। আসলে স্টাগেলের আনন্দটা আমি এখনও অনুভব করি। বি. শান্তরাম-এর ছবি ‘আমার ভুপালের’ বাংলা ভার্সন নীতিন দাসের ছবিতে আমি প্রথম বাংলা গান করি ‘ঘনশ্যামও সুন্দরও’

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়: গানটা গৌরিপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য লেখা? সুরটা কার?

মান্না দে: হ্যাঁ। সুর ছিল স্বর্গীয় বসন্ত দেশাইয়ের।

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়: আপনার জীবনে দুজন মানুষের জায়গা অপরিসীম। এক আপনার কাকা, স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র দে এবং স্বর্গীয় শচীন দেব বর্মন। আচ্ছা শচীন দা'র সহচরী হিসাবে কাজ করতেন এটা কী স্মৃতি?

মান্না দে: হ্যাঁ, অ্যাসিসটেন্স ছিলাম।

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়: কী কী শিখেছেন শচীন দার কাছ থেকে?

মান্না দে: আসলে ওনার সেন্স অব হিউমার ছিল খুব দারুন। আর আমি এটা ওনার থেকে শিখেছি। আসলে আমি বিশ্বাস করি কারুর ল্যাক অব সেন্স অব হিউমার সেটাকে নষ্ট করে।

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়: আমার লেখা গান ‘সব খেলার সেরা বাঙ্গালীর তুমি ফুটবল’, এটা আপনাদের দুজনকে নিয়েই লেখা। সেখানে আপনি মোহনবাগান এবং শচীন দা ইস্ট বেঙ্গল, খেলার দিনে একটা ঘটনা যদি একটু বলেন?

মান্না দে: গান রিহার্সাল থামিয়ে কুপারস্ খেলা দেখতে যেতাম। চুপচাপ চাইছি যেন মোহনবাগান জেতে। মোহনবাগান গোল দিলেই শচীনদা ‘চল আর খেলা দেখতে হবে না’। আমার মনের আনন্দতো আর দেখাতে পাচ্ছি না যাইহোক।

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়: আপনি বিভিন্ন ভাষায় গান করেছেন। লতা মঙ্গেশকরের কথায় আপনি মারাঠি দের থেকেও ভালো উচ্চারণ করেন। সুরকাররা কি শিখিয়ে দেন?

মান্না দে: না সেটা নয়। তবে এটা পুরোটাই সুরকাররা শিখিয়ে দেন। সুরকারের দেখে শিখতে হয়। উনি কীভাবে উচ্চারণ করছেন এবং উনি কীভাবে বলাতে চান। এটা একটা চ্যালেঞ্জ।

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়: ডঃ কৈলাশের কাছে শোনা আপনার গান বাজনা নাকি স্কটিশ চার্জ কলেজ থেকে?

মান্না দে: কুস্তিগীর মানিক আমার বন্ধু। ও আর আমি দুজনে গান ভালোবাসতাম। আর গানবাজনা প্রথম ব্যাঞ্চে বসে করা যায় না শেষ বেঞ্চে বসে করতে হয়। ওইটাই। আর কিছু নয়।

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়: বোম্বেতে আপনার অনেক নাম, আপনি বাংলা গান এড়িয়ে চলতেন। কেন?

মান্না দে: আসলে কেউ আমাকে তেমন পাত্তা দিত না সেইজন্য। অনিল বাগচী এম.এ পাশ। সুন্দর ইংরাজি বলতেন। আমি অনেক গান ওনার কাছ থেকে শিখেছি।

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়: বোম্বে থেকেও বাংলা গান কী করে মাথায় রাখেন?

মান্না দে: বোম্বেতে ৩৫ বছর থাকলেও আমি মনে প্রাণে বাঙ্গালী। রবীন্দ্রনাথের গান, অতুল প্রসাদের গান, কাজী সাহেব (কাজী নজরুল ইসলাম) গান, যতরকমের বাংলা হোক আমি শুনি। এবং আমার স্ত্রী কেরলের মেয়ে হয়েও ও শোনে। বাংলা গান করেন এবং আমরা বাংলায় কথা বলি। গানের মধ্যে একটা সর্বভারতীয় অ্যাপিয়ারেন্স রাখার চেস্টা করি। স্পেশাল ব্যাপার হল আমার বউয়েরও ভালো লাগে।

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়: ভবিষ্যত শিল্পীদের জন্য কী ভেবেছেন?

মান্না দে: যারা গান বাজনা শিখছেন তারা ভালো ওস্তাদের কাছে গান শিখুন এবং ভালোভাবে পরিশ্রম করুন। পরিশ্রম করলেই পথ খুলবে। আমি অনেক কিছু পেয়েছি। সবথেকে বড়ো সকলের ভালোবাসা পেয়েছি। এটাই অনেক।